বাঙলার পাঠশালা বাংলাদেশের সংবিধান দ্বিতীয় স্মারক বক্তৃতা ২০১৪

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশের সংবিধান

সুলতানা কামাল

বাঙলার পাঠশালা ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের সংবিধান দ্বিতীয় স্মারক বক্তৃতার জন্য আমাকে বক্তা নির্ধারিত করে বিশেষভাবে সম্মানিত করেছে। আমি পাঠশালার কর্মকর্তাবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি এখানে বিশেষভাবে কথাটা ব্যবহার করছি এই কারণে যে, আমার আগে বাঙলার পাঠশালা বাংলাদেশের সংবিধান (২০১৩) প্রথম স্মারক বক্তার ভূমিকাটি পালন করেছেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রয়াত বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন, ১৬ নভেম্বর ২০১৩)। তিনি যে কাজটি করার দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছিলেন সেই একই দায়িত্ব পালনের সুযোগ পাওয়া নিশ্চয়ই আমার জন্য অতীব গৌরবের বিষয়। আমি এই উপলক্ষ্যে বিচারপতি হাবিবুর রহমানকে স্মরণ করছি পরম শ্রদ্ধাভরে।

আজকের বাংলাদেশে সংবিধান সম্পর্কে কথা বলতে গেলে পদে পদে হোঁচট খেতে হয়। সেপ্টেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত আমাদের এই সংবিধান সংশোধিত হয়েছে সর্বমোট ষোল বার। ষোল বার সংশোধনীর কাটাছেঁড়ায় সংবিধানের আসল চেহারা যে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হবে সে কথা বলাই বাহুল্য। স্মরণ করা যেতে পারে একাত্তরের ২৬ শে মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে পথ চলে ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ বিজয় অর্জন করে। বাংলাদেশের গণপরিষদ সংবিধান গ্রহণ করে ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর যা বলবৎ হয় সেই বছরেরই ১৬ই ডিসেম্বর তারিখ থেকে। ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদ এখন পর্যন্ত সর্বশেষ অর্থাৎ ষোড়শ সংশোধনী পাশ করে।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশের শাসন ও পরিচালনা চলেছে ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রকে অনুসরণ করে। এই ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে যে, ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৭১ সালের ১৭ই জানুয়ারি পর্যন্ত যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তার উদ্দেশ্য ছিল নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা একটি সংবিধানও প্রণয়ন করা। কিন্তু পাকিস্তানের অন্যায় গণহত্যার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করে এই বলে যে, "যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ তাদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী উদ্দীপনার মাধ্যমে বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, সেহেতু আমরা বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ, বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী জনগণ কর্তৃক আমাদিগকে প্রদত্ত কর্তৃত্বের মর্যাদা রক্ষার্থে নিজেদের সমন্বয়ে যথাযথভাবে একটি গণপরিষদ রূপে গঠন করিলাম।"

১৯৭২ সালের বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান রচিত ও সেই বছরেরই ১৬ই ডিসেম্বর তা কার্যকরি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশ এই ঘোষণাপত্র অনুযায়ীই রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। সংবিধানের চতুর্থ তফসিল হিসাবে অন্তর্ভূক্ত দলিল 'ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী' অনুযায়ী আমরা জানতে পারি প্রজাতন্ত্রের জন্য সংবিধান রচনার যে দায়িত্বভার গণপরিষদের ওপর ন্যস্ত

ছিল, সংবিধান প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই গণপরিষদ ভেঙ্গে দেওয়া হয়। তবে ধারাবাহিকতা রক্ষা ও অন্তবর্তী ব্যবস্থা ব্যহত না করার জন্য তফসিলের ৩(১) অনুচ্ছেদে বলা হয় যে, ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে সংবিধান প্রবর্তনের তারিখ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে প্রণীত বা প্রণীত বলে বিবেচিত সকল আইন স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র বা যে কোনো আইন থেকে আহরিত বা আহরিত বলে বিবেচিত কর্তৃত্বের অধীন ঐ মেয়াদের মধ্যে প্রযুক্ত যেসকল ক্ষমতা বা কাজ করা হয়েছে তার সমর্থন ও অনুমোদন দেওয়া হয় এবং এ সমস্ত কিছুই আইনানুযায়ী যথাযথভাবে প্রণীত, প্রযুক্ত ও কৃত বলে ঘোষণা করা হয়। এতো গেলো আমাদের সংবিধানের ইতিহাসের গোড়ার দিক্‌কার কথা।

১৯৭২ সালে আমরা যে সংবিধান পেলাম তা তৈরি হয়েছিল এদেশের মানুষের ১৯৫২ সাল থেকে তিল তিল করে গড়ে তোলা স্বপ্নের ওপর ভিত্তি করে। আমরা দাবী করি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মূল উৎস হচ্ছে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন– যেখানে আমরা নিজের ভাষায় কথা বলার স্বাধীনতা দাবী করেছিলাম, নিজেকে তৈরি করতে চেয়েছি নিজের সংস্কৃতির আলোয়, চেয়েছি আমি যা– সেই পরিচয়েই নিজের দেশের মাটিতে মাথা উঁচু করে বাঁচার অধিকার। এটি আমার জন্য যেমন সত্য তেমনি তা অন্যের জন্যও সমান সত্য হোক– এমনটিই চেয়েছি আমরা। তাইতো ২১শে ফেব্রুয়ারি আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে স্বীকৃত।

সেই চেতনার পথ ধরেই আমরা এগিয়েছি যার ধারাবাহিকতায় ষাটের দশকে আমরা সংগ্রাম করেছি সাংস্কৃতিক স্বাধীকারের জন্য। পরিষ্কার ভাষায় বলেছি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা হবে সর্বজনীন এবং অবশ্যই অসাম্প্রদায়িক। কথাটা অন্যভাবে বললে, আমরা নিজেদের কোনো বিশেষ একটি খণ্ডিত পরিচয়ের গণ্ডিতে বাঁধতে চাই নাই। আমরা নিজেদের বলেছি "মানুষ হও"। আবার এও বলেছি যে বাঙ্গালী হতে যেয়ে যেন মানুষ হওয়া থেকে বিচ্যুত না হই, বিশ্বমানবতার বিশালতায় আমার মূল পরিচয়টা যেন হারিয়ে না যায়।

বহুমাত্রিক পরিচয়বহনকারী এই বাংলাদেশের মানুষেরা বহুমাত্রিক পরিচয়েই বাঁচতে চেয়েছে– আপন মর্যাদায়, গৌরবে ও মহিমায়। আমরা বলেছি অর্থনৈতিক বৈষম্য দিয়ে আমাদের পদদলিত করে রাখা চলবেনা। সমাজ বা রাজনীতিতে আমাদের প্রাপ্য অবস্থান থেকে দূরে রাখাও চলবেনা। মোদ্দা কথা বৈষম্যহীন সমাজের সারমর্ম তুলে ধরেছি আমরা ১১ দফা ও ৬ দফা দাবীতে। সামরিকতন্ত্র, উগ্রধর্মীয় রক্ষণশীলতা বা মৌলবাদকে প্রত্যাখ্যান করেছি হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খৃস্টান নির্বিশেষে ধর্মপ্রাণ ও সহনশীল এদেশের মানুষেরা। "জয় বাংলা" ছিল আমাদের রণহুংকার, কিন্তু আমরা পরম মমতায় শ্লোগান দিয়েছি "তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা।" নিজেকে আমরা চিনে নিতে চেয়েছি এদেশের মাটি, প্রকৃতি, নদী থেকে উৎসারিত সত্ত্বা হিসাবে।

তাই আমাদের সংবিধান, যার একটি আভিধানিক অর্থ হচ্ছে রাষ্ট্রের সংগঠন ও পরিচালনা পদ্ধতি– সহজ ভাষায় রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন– সেখানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল চারটি নীতির

অন্যতম হিসাবে স্থান পেয়েছিল ধর্ম নিরপেক্ষতা। অন্য তিনটি হল– জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র।

সংবিধানের আরও কয়েকটি অনুচ্ছেদের কথা উল্লেখ করতেই হয়। সংবিধানটি ১১টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে; এগুলো হলো: প্রজাতন্ত্র, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, মৌলিক অধিকার, নির্বাহী বিভাগ, আইনসভা, বিচার বিভাগ, নির্বাচন, মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশের কর্মবিভাগ, জরুরি বিধানাবলী, সংবিধান সংশোধন ও বিবিধ বিষয়। সংবিধানে ৭টি তফসিলও যুক্ত করা হয়েছে। এই তফসিলগুলোতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে যথাক্রমে অন্যান্য বিধান থাকা স্বত্ত্বে কার্যকর আইন (প্রথম তফসিল), শপথ ও ঘোষণা (তৃতীয় তফসিল), ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী (চতুর্থ তফসিল)। এখানে উল্লেখ্য যে, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম তফসিল সংশোধিত হয়েছে পঞ্চদশ সংশোধনের সময়ে। এই তিনটি তফসিল হলো ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তারিখে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেওয়া ঐতিহাসিক ভাষণ (পঞ্চম তফসিল)। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ মধ্যরাত শেষে অর্থাৎ ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত স্বাধীনতার ঘোষণা (ষষ্ঠ তফসিল) এবং ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র (সপ্তম তফসিল)। উল্লেখ্য দ্বিতীয় তফসিল বিলুপ্ত করা হয়েছে। সংবিধানের পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম তফসিল হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করার বিষয়ে যে বক্তব্য দেওয়া হয়েছে পঞ্চদশ সংশোধনীর উপক্রমনিকাতে সেটা উদ্ধৃত করছি।

বলা হচ্ছে: "সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধনী) আইন, ২০১১ এর মাধ্যমে ১৯৭২ সালে গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত সংবিধানের মূল চেতনা ফিরিয়া আসিয়াছে। মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সম্পর্কে সংক্ষেপে যথাযথ ধারণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি রোধের রক্ষাকবচ হিসাবে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙ্গালী জাতিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়া ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন এবং তিনি ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের মধ্যরাত শেষে অর্থাৎ ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার যে ঘোষণা দেন এবং ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর সরকার কর্তৃক জারীকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র যথাক্রমে সংবিধানের পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম তফসিল হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করিয়া বাংলাদেশের সাংবিধানিক ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হইয়াছে। গণতন্ত্র রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য বিধায় সংবিধান অনুযায়ী প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণের বিধান সমুন্নত রাখিবার জন্য সংবিধান (ত্রয়োদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯৬ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক বাতিল ঘোষিত হওয়ায় উক্ত রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইয়া নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্ত করা হইয়াছে।"

এই চেতনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ৭২ এর মূল সংবিধানের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অনুচ্ছেদ হচ্ছে ৭(১) এবং (২), যেখানে বলা হচ্ছে– "প্রজাতন্ত্রের ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।" (৭)(ক)

এবং জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোনো আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্য হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে" (৭)(২)।

প্রণিধানযোগ্য আর একটি অনুচ্ছেদ হচ্ছে অনুচ্ছেদ-১১, উদ্ধৃত করছি- "প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র। যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্ত্বার মর্যাদা ও মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।" কী গভীর অঙ্গীকারের কথা। আপনাদের কিঞ্চিৎ ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়ে যদি ৭(২) অনুচ্ছেদের সাথে এ অংশটা মিলিয়ে পড়ি, কি অভূতপূর্ব আন্দোলন জাগে মনের ভিতরে এ কথাটা উচ্চারণ করতে যে আমি জনগণের এক অংশ– এ কথা বলছি যে, আমার অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তি হচ্ছে মানবসত্ত্বার মর্যাদা ও মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত করা, মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চয়তা রক্ষা করা। এ আমার দায়, আমার দায়িত্ব। আমার ভাবনা, আমার চিন্তা, আমার প্রত্যয়, আমার প্রতিজ্ঞা।

আর নারীদের কথা? ১৯(৩) অনুচ্ছেদের ঘোষণা দেওয়া হলো জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে। মৌলিক অধিকার অধ্যায়ে ২৭ অনুচ্ছেদে বলা হলো সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী। ২৮ অনুচ্ছেদের বক্তব্য হলো ধর্ম, গোষ্ঠি, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবেনা। ২৮(২) আর (৩) অনুচ্ছেদের স্পষ্ট করা হয়েছে নারীদের জনসাধারণের কোনো বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোনো রকম অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাবেনা। আর অনুচ্ছেদ ২৮ এরই (৪) দফা অনুযায়ী নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোনো অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হতে এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করবে না।

একথা মনে করার কোনো কারণ নাই যে নারীরা খুব সহজেই অথবা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সংবিধানের এই সংরক্ষণ পেয়েছেন। এজন্য নারীদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম করতে হয়েছে প্রাণপনে। বহু ঘাত-প্রতিঘাত, সংঘাত ও সামাজিক নিপীড়নের মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে তাদের স্বাধীনতা, মুক্তি আর আইনের অধিকারের সংবিধানগত স্বীকৃতির দাবীটিকে। নারীরা নিজেদের আন্দোলনকে অত্যন্ত সার্থকতার সাথে সম্পৃক্ত ও সংযুক্ত করেছে মূলধারার রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগ্রামের সাথে। একেবারে প্রান্তিক ও অধিকার বঞ্চিতদের সাথে একাত্ম হয়ে সেই ৫২ সাল থেকে ৬ দফা, ১১ দফার আন্দোলন, ৬৯ এর গণআন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ, অবরুদ্ধ বাংলাদেশে সর্বাত্মক প্রতিরোধের অত্যন্ত বিপদজনক ও ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্বটি প্রধানত: পালন করেছেন নারীরা। তাই স্বাধীন বাংলাদেশে তাদের পূর্ণ নাগরিকত্বের মর্যাদা রক্ষায় রাষ্ট্রের যে অঙ্গীকার, নির্দ্বিধায় বলা যায় তা স্বোপার্জিত অবশ্যই। উল্লেখযোগ্য, সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগ, যেখানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সন্নিবেশিত করা হয়েছে সেখানে দ্ব্যর্থহীনভাবে সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার, ধর্মনিরপেক্ষতা,

মালিকানার নীতি, কৃষক-শ্রমিকের মুক্তি, মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা, গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব, সর্বজনীন শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা, পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, সুযোগের সমতা, অধিকার ও কর্তব্যরূপে কর্ম, নাগরিক ও সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্য, নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ, জাতীয় সংস্কৃতি, আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে রাষ্ট্রের যে ভূমিকা নির্দেশিত হয়েছে, তাও এদেশের মানুষের দীর্ঘদিনের সংগ্রামের ফসল। একই সঙ্গে সংবিধানের তৃতীয় ভাগ, যেখানে মৌলিক অধিকার বিবৃত করা হয়েছে সেই অধ্যায়টি স্মরণ করা আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে অনুচ্ছেদ ৩১ থেকে ৪০ পর্যন্ত, যে সমস্ত অনুচ্ছেদে আইনের আশ্রয় লাভ, জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা, গ্রেফতার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ, জবরদস্তি শ্রম, বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে রক্ষণ, চলাফেরা, সমাবেশ, সংগঠন চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক্‌স্বাধীনতা ও পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে সংবিধান সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে গর্বিতবোধ না করে পারা যায় না। আমরা যদি লক্ষ্য করে থাকি, নিশ্চয়ই চমৎকৃত হতে পারি একথা জেনে যে একটি যুদ্ধবিধ্বস্থ দেশ গণহত্যার নির্মমতায় সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত-বিপন্ন মানবসত্ত্বা, আত্মীয়-স্বজন হারানো মানুষগুলি মাত্র এক বছরের সময়ের ব্যবধানে জনগণের ইচ্ছার পরম অভিব্যক্তিরূপে এই অনবদ্য সংবিধানটি প্রণয়ন করার সামর্থ্য প্রদর্শন করল। একেবারে নিখুঁত একটি সংবিধান যে আমরা রচনা করেছি সে দাবী করা যাবে না। দেশটিকে যে সাংবিধানিকভাবে 'প্রজাতন্ত্র' বলা হচ্ছে তাও খটকা জাগায় অনেকের মনে। কিন্তু এ সংবিধান অবশ্যই একটি জাতির দীর্ঘদিনের সংগ্রামের চিন্তার গভীরতা ও "সবার উপরে মানুষ সত্য" বিশ্বাসের স্বাক্ষর রাখে। এ দেশের মানুষ উদ্বেলিত হয় "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে" প্রার্থনার উচ্চারণে। একবার ভাবি, পৃথিবীর বড় বড় দেশের জাতীয় সঙ্গীতে প্রকাশ পায় সে দেশের শক্তিমত্তার ভাব। কোন দেশ তাদের সৈন্যবাহিনী এগিয়ে চলার গর্বের কথা বলে, কোন দেশ তার রাজা-রাণীর দীর্ঘায়ু কামনা করে। একই রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রণীত জাতীয় সঙ্গীতে ভারত তার জনগণ মন অধিনায়ক ভাগ্য বিধাতার জয়গান কণ্ঠে ধারণ করে। আমরা বেছে নিলাম রবীন্দ্রনাথেরই রচিত গগন হরকরার সেই হৃদয় নিংড়ানো বাউল সুরের ওপর ভিত্তি করা গান, "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।" অন্তর থেকে, নাড়ি থেকে গাইলাম সেই গান, শুধু ওষ্ঠ বা কণ্ঠ থেকে নয়।

আর গগন হরকরার সেই গানের কথাটা কি? 'আমি কোথায় পাবো তারে, আমার মনের মানুষ যে রে'। এই যে মনের মানুষ এর সন্ধ্যান, সেই সন্ধ্যান কি কখনও হতে পারে সাম্প্রদায়িক, কুপমন্ডুক, ধর্মব্যবসায়ী, অন্যের অধিকার কেড়ে নেওয়া প্রবন চর দখলের সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত নারী নির্যাতনকারী আর শিশুর অধিকারের প্রতি উদাসীন মানুষ? এক কথায় সে সন্ধ্যান কি মানবতা ও মনুষত্ববোধহীন এক সত্ত্বার সন্ধ্যান? কখনই নয়। এদেশের মানুষ পরম মমতায় ভালোবেসেছে তার দেশের মাটিকে। যখন বলতে চেয়েছে যে এদেশের মালিক হচ্ছে এদেশের জনগণ, তখন কখনই দখলের তা ক্ষমতার দাপটের মালিকানার চিন্তা-চেতনা থেকে বলেনি এটা নিশ্চিত। বলেছে ভালোবাসার বোধ থেকে, যত্নের বোধ থেকে, এদেশকে গড়ে তোলার, এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বোধ থেকে। এই আশা থেকে যে নিজের হাতেই নিজে এই দেশটাকে মানুষ

যাতে মানুষের মতো বেঁচে থাকতে পারে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তেমন একটা দেশ হিসাবে তৈরি করে নিবে।

তবে একথা সত্য যে, ইতিহাস বাংলাদেশের প্রতি সদয় ছিলনা। এতো সংগ্রাম, এতো আন্দোলন, এতো ত্যাগ, এতো প্রাণক্ষয় অথবা প্রাণদান এর ওপর নির্মিত মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ চলে যায় সেনা দখলে। অথচ বাংলাদেশের মানুষ সেনা শাসনের বিরূদ্ধে তাদের মতামত জানিয়ে দিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম উপাদান হিসাবে, ৬৯ এর গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে।

পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্ট সেনাবাহিনীর কিছু সদস্য বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অবিসংবাদিত নেতা, স্বাধীন দেশের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে। জেলখানায় রাষ্ট্রীয় হেফাজতে থাকা জাতীয় চার নেতাকে কাপুরুষজনোচিতভাবে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়ে আওয়ামী লীগেরই বিশ্বাসঘাতক কিছু সহযোগীর সাথে যোগসাজসে তারা ন্যাক্কারজনকভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে। ভাগ্যক্রমে বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা রক্ষা পেয়েছিলেন। ঘাতকেরা অজুহাত দেখিয়েছিলেন যে, বাংলাদেশকে রক্ষা করার জন্য তারা এ কাজটি করতে বাধ্য হয়েছেন। তাদের মন-মানসিকতায় অবশ্য বাংলাদেশ বলতে এদেশের মানুষ, জন-জীবন, প্রকৃতি, নদী-খাল-বিল, এদেশের নৃত্য, এদেশের মাটির গান, ভাষা আর নিজের স্বাধীনতা নিয়ে গড়ে ওঠার ও বেঁচে থাকার সংস্কৃতি কিছুই ধরা পড়েনা। ঠিক পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর মতোই তারাও বাংলাদেশ বলতে এই ৫৬ হাজার বর্গ মাইলের ভূ-খণ্ডটিকেই বোঝে, তা সে একখণ্ড "পোড়ামাটি" হলেও তাদের চলে যায়। তা না হলে, যদি তাদের ভাষ্য অনুযায়ী বাংলাদেশকে রক্ষা করাই এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডগুলির উদ্দেশ্য ছিল, সংবিধানের মূল নীতির পরিবর্তন আনার কি তাগিদ ছিল তাদের? এক কলমের খোঁচায় পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতা উড়িয়ে দিয়ে সমাজতন্ত্রকে নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে নতুন কিছু সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানকে সঙ্কুচিত করে কেমন বাংলাদেশ তারা কায়েম করতে চেয়েছিল?

বাংলাদেশের মানুষের জাতীয়তার ক্ষেত্রে যেখানে একমাত্রিক পরিচয় থেকে বহুমাত্রিকতাকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, সেখানে তাতে এমন পরিবর্তন আনা হলো যে দেশটি স্পষ্টতই একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের দেশের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ধারণ করল। কৌশলটি, ধারণা করা যায়, নেওয়া হয়েছিল হত্যাকাণ্ডগুলিকে একটি নৈতিক প্রতিরক্ষার ঢালে আড়াল করার জন্য। অপর কৌশলটি ছিল আইন কেন্দ্রিক। উদ্দেশ্য ছিল "ইনডেমনিটি" শীর্ষক ব্যবস্থাটি গ্রহণ করে হত্যাকারীদের বিচারের আওতা থেকে বাঁচিয়ে দেওয়া। তাদের গৃহীত এই পদক্ষেপগুলোই সাক্ষ্য দেয় যে, পঁচাত্তরের ঘটনার কুশীলবদের এ ঘটনা ঘটানোর পিছনে কোনো 'সরল বিশ্বাস' কাজ করেনি।

তারা যে এদেশটিকে মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশের যে রূপরেখা তার থেকে বিচ্যুত করে সম্পূর্ণ ভিন্ন চেহারার এক বাংলাদেশে রূপান্তরিত করে এক 'কিম্ভূতকিমাকার' দেশে পরিণত করতে চেয়েছে তার পরিচয় ক্রমশঃ স্পষ্ট হতে থেকেছে মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে, যারা বাংলাদেশ

নির্মাণ করায় প্রাণপাত করেছেন তাদের কাছে। কিন্তু আশ্চর্য্যজনক হলেও সত্য– এই ব্যক্তিদের সৃষ্টি করা ধুম্রজালে বিভ্রান্ত বহুজন।

এদের মধ্যে এমন কয়েকজনও রয়েছেন যাদের এই বিভ্রান্তি যেমন বেদনাদায়ক তেমনি যে কোনো বিবেকবান মানুষকে হতবুদ্ধি করে দেওয়ার মতো। স্বার্থান্বেষণ এবং ক্ষমতার ভাগাভাগিতে তাদের নির্লজ্জ লাফঝাঁপ দেখে ভীত-শঙ্কিত মানুষ যেন নিক্ষিপ্ত হয় এক দিশাহারা অন্ধকারে। বাংলাদেশ যে দুঃস্বপ্নের লম্বা পাঁকে পতিত হয়, তার জের জাতিকে এখনও বয়ে বেড়াতে হচ্ছে।

১৯৭৮ সালের পঞ্চম সংশোধনীর পর আর এক সামরিক শাসকের সংশোধনী এল অষ্টম সংশোধনীর নামে। ঘোষণা করা হল বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম হবে ইসলাম। এদেশের মানুষ জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সাধারণভাবে ধর্মপ্রাণ, ধর্মভীরু। কিন্তু ধর্মান্ধতাকে তারা কখনও নিজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে গ্রহণ করেনি বরং কোনো রকম দ্বিধাদ্বন্ধ ব্যতিরেকেই তারা বারবার জানান দিয়েছে হাজার বছরের অসাম্প্রদায়িক ধর্ম নিরপেক্ষ দর্শনকেই তারা জীবনের নির্দেশিকা হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

আপাতঃভাবে পঞ্চম ও অষ্টম সংশোধনীকে যতই নীরিহ বলে মনে হোক না কেন– এই সংশোধনীগুলির সময়কালে একই সাথে ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিকে দেশে ফিরিয়ে এনে পূনর্বাসিত করে তাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিয়ে ধর্মাশ্রিত রাজনীতি করার ওপর যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল তা তুলে নেওয়া হলো। তার ফলে রাষ্ট্র যে সাম্প্রদায়িক, রক্ষণশীল চরিত্র ধারণ করল তার একটা সুদূরপ্রসারি প্রভাব পড়ল সামগ্রিক রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের প্রতিটি স্তরে। নারীর অধিকার, দেশের অ-মুসলিম জনগোষ্ঠি, যৌনগত সংখ্যালঘিষ্ঠ জনগণ এর সম-অধিকার এর ধারণার অস্বীকৃতিকেই ন্যায্যতা ও বৈধতা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হলো। এমনকি মুসলিম সম্প্রদায়ভূক্ত আহমদীয়া জনগোষ্ঠিকে অমুসলিম ঘোষণা করার সহিংস দাবী তোলার সূচনা করা হলো। এক পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার যাঁকে তাঁর দল তাঁর মরনোত্তর সময়ে স্বাধীনতার ঘোষক বলে দাবী করে থাকেন, সেই দলের আমলেই ব্লাসফেমী আইন প্রণয়নের দাবী তোলা হলো। তাদের নির্বাচন জেতার পরবর্তী পর্যায়ে সংখ্যালঘুদের ওপর অভূতপূর্ব আক্রমন ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটল, মুক্তিযুদ্ধবিরোধী আল-বদর কমান্ডার মন্ত্রীত্ব পেলেন এবং অপর মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী যুদ্ধাপরাধী বলে চিহ্নিত ব্যক্তিও সেই পদমর্যাদায় তাদের গাড়ীতে মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের রক্তে রঞ্জিত লাল সূর্যখচিত পতাকা লাগিয়ে শদীদদের স্মৃতির প্রতি চরম অবমাননা প্রদর্শন করে, বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বাংলাদেশের শাসনভার পালন করল। তারও চেয়ে বিস্ময়ের বিষয়, এ সমস্ত দেখেও এদেশের মানুষের বুকের ভিতর ব্যথায় মোচড় দিয়ে ওঠেনি। রাগে, ঘৃণায় বিদ্রোহ করে উঠেনি। ব্যাংক, বীমা, শিক্ষা ব্যবস্থা, চিকিৎসা, প্রশাসন, প্রতিরক্ষা সব ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী অবস্থান দৃঢ় করে নিতে সক্ষম হলো এই রাজনৈতিক দলগুলি।

১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত দুইজন সামরিক জেনারেলের প্রত্যক্ষ সামরিক অথবা গণতান্ত্রিক শাসনের আড়ালে সামরিকতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতায় সরাসরিভাবে বাংলাদেশে উগ্র, জঙ্গী ইসলামীকরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার ফলে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এর এত গভীর প্রভাব পড়ল যে অত্যন্ত ন্যায্যভাবে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়ার দাবীদার দল আওয়ামীলীগ ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাজনীতির অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েও সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ এবং জোটবদ্ধভাবে তিন-চতুর্থাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনের মাধ্যমে ধর্ম-নিরপেক্ষতা ফিরিয়ে আনল বটে কিন্তু রাষ্ট্রধর্মের বিষয়টিতে স্পষ্ট অবস্থান নিতে পারল না। আশ্চর্য্য হলেও সত্যি মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশে ৭১ এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে যেয়ে সীমাহীন দূর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে। এমনকি সাধারণ জনগণকেও পেট্রোল বোমা আর নানা আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত হতে হচ্ছে। যুদ্ধাপরাধী, যারা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে তাদের শাস্তি ঘোষিত হলে লাগাতার হরতালের কবলে জনজীবন বিপর্যস্ত হওয়ার মতো ঘটনা ঘটে এদেশে। নতুন প্রজন্ম ইতিহাসের কথা শুনলে সত্য-অসত্য নির্ণয় করতে পারে না। নারীরা ক্রমশঃ পর্দার আড়ালে নিরাপত্তা খুঁজতে চেষ্টা করছে। শিশুরা মুখে বুলি ফোটার সাথে সাথে ধর্মীয় পরিচয় নিয়ে কথা বলতে শিখে যায় এবং সাম্প্রদায়িক চেতনাকে যথার্থ বলে মনে করে। অ-মুসলিম অথবা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জমি-জমা, জীবন সবই দখলের লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ ক্রমশঃ প্রান্তিক স্থানে সরে যেতে বাধ্য হচ্ছে। দুঃখের সাথে এও বলতেই হয় অনুচ্ছেদ ৩১ থেকে ৩৫-এর লঙ্ঘন জাতিকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দেয় প্রায়ই। রাষ্ট্র এতই আত্মরক্ষামূলক আচরণ করতে শুরু করল যে তার জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের অভিজ্ঞতা জনজীবনে ম্লাণ হয়ে গেল।

ইতিহাসের স্বার্থে এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯৭৪ সালের চতুর্থ সংশোধনী যার মাধ্যমে একদলীয় শাসন প্রবর্তন করা হয়েছিল, সেটা নিয়ে নানা বিতর্ক ও প্রশ্ন উঠেছিল, সংশোধনটি পরবর্তী সময়ে বাতিল করা হয়েছিল। সংবিধান তার মিশ্র চরিত্র নিয়ে পূর্ণশক্তিতে এর প্রতিকার দিতে পারছে না। ষোলটি সংশোধনের অনেকগুলিই একে অপরের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ষোড়শ সংশোধনী এসেছে বিচারপতিদের অভিশংসনের ক্ষমতা সংসদের হাতে তুলে দিয়ে। এই সংশোধনী নিয়ে নানা আশঙ্কার প্রকাশ ঘটেছে। সপক্ষেয় যুক্তি দেয়া হয়েছে পৃথিবীর বহুদেশে এই রীতি রয়েছে। বাংলাদেশের ৭২'র মূল সংবিধানেও এই বিধান ছিল। পরবর্তী সময়ে তা অর্পিত হয়েছিল। রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের হাতে। সেই ক্ষমতা আবার ফিরিয়ে দেওয়া হলো সংসদ সদস্যদের এই যুক্তিতে যে তারা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে এই ক্ষমতা পাওয়ার যোগ্যতম ব্যক্তি। বলা হচ্ছে "প্রমাণিত অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের কারণে সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন দুই তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতার দ্বারা সমর্থিত সংসদের প্রস্তাব ক্রমে প্রদত্ত রাষ্ট্রতির আদেশ ব্যতীত কোনো বিচারককে অপসারিত করা যাইবে না।" এই অনুচ্ছেদের অধীনে প্রস্তাব সম্পর্কিত পদ্ধতি এবং কোনো বিচারকের অসদাচরণ বা অসামর্থ্য সম্পর্কে তদন্ত ও প্রমাণের পদ্ধতি সংসদ আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

কোনো বিচারক রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রের মাধ্যমেও পদত্যাগ করতে পারেন। যারা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন এই ক্ষমতা হস্তান্তরে তাদের বক্তব্য হলো বর্তমানকালে

বাংলাদেশের সংসদে ভারসাম্যতার দৃশ্যমান অভাব রয়েছে এবং প্রকারান্তরে নির্বাহীদের মূলতঃ প্রধান নির্বাহী ইচ্ছা-অনিচ্ছাতেই আইন প্রণেতারা তাদের মতামত চালিত করে থাকেন। তার ফলে বিচারপতিদের আচরণ ও সামর্থ্য কতটা নিরপেক্ষভাবে বিবেচিত হবে, সে নিয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। সংসদ সদস্যরা ইদানিংকালে বিচারপতিদের কিছু পদক্ষেপ সম্পর্কে যে ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন ও বক্তব্য রেখেছেন সেখানে এই শঙ্কা একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

আমরা, বাংলাদেশের জনগণ যে সবাইকে, সবার স্বার্থকে অন্তর্ভূক্ত করে একটি অনবদ্য সংবিধানের শক্তিশালী রূপ নিয়ে– যে কোনো পরিচয় নির্বিশেষে সবার বরাভয়, সবার স্বার্থ, অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা করার সবচেয়ে বড় দলিল হিসাবে পেতে চেয়েছি– তাকে খণ্ডিত করে ফেলা হয়েছে। আশা নিশ্চয়ই ছাড়বোনা যে প্রগতিশীল রাজনীতির চর্চা অব্যাহত রাখতে পারলে এবং রাজনীতি, সমাজ-অর্থনীতি আর সংস্কৃতি থেকে মানবতাবিরোধী, যুদ্ধাপরাধী মুক্তিযুদ্ধের বৈরী শক্তি, উগ্র-জঙ্গী ধর্মান্ধ মৌলবাদকে বিতাড়িত করতে পারলে এই সংবিধান আবার সব মানুষের সংবিধান হয়ে উঠবে। তরুণ প্রজন্ম এদেশটি সকল 'ভূমিসন্তানের' দেশ হিসাবে তৈরি করে নেবার দিকনির্দেশনা আবার নতুন করে এই সংবিধানে সন্নিবেশিত করে নেবে। এদেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্নের বাস্তবতার স্পর্শ পাবে।